# বাংলাদেশে অনুবাদ চর্চা

আহমেদ মাওলা

অনুবাদ মানে কেবল ভাষান্তর নয়, এক ভাষার ভাব-সম্পদ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করাও। মানুষের সাথে মানুষের, ভাষার সাথে ভাষার, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের অকৃত্রিম সেতুবন্ধন রচনার মাধ্যম হিসেবে অনুবাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। যদিও অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যের রসাস্বাদন কতটা নির্ভরযোগ্য, তা নিয়ে নানা মতভেদ, মতান্তর, এমনকি বিদ্রূপ-তামাশারও অন্ত নেই। যেমন, একটি লাতিন প্রবাদে আছে, 'অনুবাদ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক'। রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন, 'বিদেশি ভাষার কাব্যিক অনুবাদ পড়ে পাঠকের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা ষোল আনা।' কেউ কেউ বলেন, 'অনুবাদে মূল লেখক আড়ালেই থেকে যান।' আরও মজার তথ্য হচ্ছে, 'সবচেয়ে ভালো অনুবাদ নাকি প্রায়শ ভুল অনুবাদ।'

অনুবাদের দুটি ভিন্ন ধারা রয়েছে, মেটাফ্রেস্টিক ও প্যারাফ্রেস্টিক। অর্থাৎ মূলানুগ অনুবাদ ও স্বাধীন অনুবাদ। অনুবাদের শরণ না নিলে দুনিয়ার সব ভাষার ধ্রুপদী সাহিত্য আমাদের অপঠিতই থেকে যেত। কথিত আছে, কবি গ্যায়েটে কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়ে কৈশোরের ফুল এবং পরিণত বয়সের ফল এক সঙ্গে পেয়েছিলেন, সেটা ছিল কেবল অনুবাদ নয়, অনুবাদের অনুবাদ। 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া আর অনুবাদ পড়া নাকি সমান কথা,' ব্যাপারটা এ রকম হলেও বাংলা ভাষায় যাঁরা বিশ্ব সাহিত্য চর্চা করেন, তাঁদের কাছে অনুবাদই একমাত্র ভরসা। কারণ, সাহিত্য-উৎসাহীদের কাছে অনুবাদ অনেকটা প্রেমিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বময় ভালোবাসা চালিয়ে যাওয়ার মতো সম্পর্ক।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারা শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে। অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালি পাঠক 'মহাভারত' আর 'রামায়ণ' পড়ার পাশাপাশি 'পদ্মাবতী', 'ইউসুফ-জোলেখা'সহ বহু ফারসি, সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তবে অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যকে জানার বিস্তৃতি ঘটেছে বুদ্ধদেব বসুসহ তিরিশের দশকের কবি-লেখকদের হাত ধরে, যে ধারা বর্তমানে পুষ্পে-পলস্নবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। অতীত ও বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিরাট একটি অংশ অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সমকালীন ইউরোপীয় ভাষাগুলোর উলেস্নখযোগ্য সাহিত্যকর্ম তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে এখন বাংলা ভাষায় অনায়াসলভ্য। প্রতিবছর বুকার ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বইসহ বেস্ট সেলার সব বই অনূদিত হয়ে বাজারে আসছে প্রায় সাথে সাথেই। এটা খুবই ইতিবাচক লক্ষণই বলতে হবে।

বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুবাদের একটি সমৃদ্ধ ধারা পরিলক্ষিত হয়। মনস্বী নাট্যকার শহীদ মুনীর চৌধুরী এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হয়ে আছেন। স্বল্প সময়ে অনেক মেধাসমৃদ্ধ কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। যেমন, র্জজ বার্নাড শর রূপান্তরিত নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না', জন গলসওয়ার্দীর 'রূপার কৌটা', শেক্সপিয়রের 'টেমিং অব দি শ্রম্ন' অবলম্বনে 'মুখরা রমণী বশীকরণ', 'ওথেলো'। এছাড়া আরও অনেকের নাম উলেস্নখ করা যায় যেমন, সরদার ফজলুল করিমের 'প্লেটোর রিপাবলিক', 'প্লেটোর সংলাপ', 'অ্যান্টিডুরিং', রুশোর 'সোস্যাল কন্টাক্ট', সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'অ্যারিস্টেটলের সাহিত্যতত্ত্ব', আহমদ ছফার 'ফাউস্ট', বার্ট্রান্ড রাসেলের 'সংশয়ী রচনাবলী', মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বার্ট্রান্ড রাসেলের অনুবাদ 'সুখ', সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদ সফোক্লিসের 'ইডিপাস', 'হুইটম্যানের কবিতা', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'অ্যারিস্টেটলের কাব্যতত্ত্ব', ইবসেনের 'বুনোহাঁস', সুব্রত বড়-য়ার 'এমিল ও গোয়েন্দা বাহিনী', 'শঙ্খচিল', শামসুর রাহমানের শেক্সপিয়রের হ্যামলেটের অনুবাদ 'ডেনমার্কের যুবরাজ', 'রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা' প্রভৃতি।

কবীর চৌধুরী বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। স্বল্প পরিসরে তাঁর অনূদিত গ্রন্থের তালিকা দেয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি উলেস্নখ করা যেতে পারে। 'শেখভের গল্প', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ওল্ডম্যান এন্ড দ্য সী', 'চুম্বন', 'প্রেম ও কলেরা', 'কাফকার নির্বাচিত গল্প', 'নেটিভসান', 'পাঁচটি একাকিঙ্কা', 'বেকেটের তিনটি নাটক'

ইত্যাদি। কবীর চৌধুরী মূলানুগ অনুবাদে সিদ্ধহস্ত। বাঙালি পাঠকের সামনে তিনি উন্মুক্ত করেছেন বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল এক ভাণ্ডার।

স্বাধীনতোত্তর সমকালীন বাংলাদেশে অনুবাদচর্চায় যাঁরা নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে অবদান রেখে চলছেন। তাঁদের মধ্যে আলম খোরশেদের ‘যাদুবাস্তবতার গাথা’, ‘লাতিন আমেরিকার গল্প’, আলী আনোয়ারের ‘অনিকেত বেদনা’, ‘খোঁজা’, খায়রুল আলম সবুজের ‘গাঙচিল’, ‘আন্তিগোনে’, ‘নোরা’, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ‘টেরি ঈগলটন : সাহিত্যতত্ত্ব’, ‘রাজা ঈদিপাস’, ‘পাউল সেলানের কবিতা’, জিলন্মুর রহমান সিদ্দিকীর ‘শেক্সপীয়রের সনেট’, ‘অ্যারিস্তপাজিটিকা’, ‘টেমপেস্ট’, কাওসার হুসাইনের ‘ইতালো কালভিনের গল্প’, ‘বেকনের প্রবন্ধ’, বদিউর রহমানের ‘অ্যারিস্টেটলের পোয়েটিকস’, ‘ধ্রুপদী সাহিত্যতত্ত্ব’, র‌্যালফ ফক্সের ‘উপন্যাস ও জনগণ’, মুহাম্মদ নুরুল হুদার ‘আগামেমনন’, ‘নীল সমুদ্রের ঝড়’, মোহাম্মদ হারুন উর রশিদের ‘তিনটি ফরাসি প্রবন্ধ’, ‘মাছি’, শফি আহমেদের ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’, ‘প্লেটোর শেষ দিনগুলি’, ‘দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য জুয়েল’, সৈয়দ শামসুল হকের ‘ম্যাকবেথ’, ‘ত্রয়লাস ও ক্রেসিদা’, ‘টেম্পেস্ট’ ইত্যাদি।

সৈয়দ শামসুল হকের অনুবাদে সৃজনশীলতার সাক্ষর রয়েছে। সমকালীন বিশ্ব সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদে যাঁরা নিরন্তর সচেষ্ট রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে খলিকুজ্জামান ইলিয়াসের ‘মিথের শক্তি’, ‘পেয়ারার সুবাস’, জি এইচ হাবীবের গ্রাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের ‘নিঃসঙ্গতার এক শ বছর’, আমোস টুটুলার ‘তাড়িখোর’, আইজাক আসিমভের ‘ফাউন্ডেশন’। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বেশকিছু লেখা অনুবাদ করেছেন মফিদুল হক, তাঁর অনুবাদের মাধ্যমেই পরাজিত পাকিস্তানি সৈনিকদের মানসিকতা সম্পর্কে জেনেছে আমাদের পাঠক।

গোলাম সামদানী কোরায়শী অনুবাদ করেছিলেন ‘আল মুকাদ্দিমা’। আনু মুহাম্মদ ওরিয়ানা ফালস্নাচির ‘হাত বাড়িয়ে দাও’সহ বেশকিছু অনুবাদ করেছেন। কবিতার অনুবাদে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ ও জুয়েল মাজহার বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তবে সুব্রতের অনুবাদে ‘নির্বাচিত ইয়েটস’ এবং এলিয়টের ‘পোড়ো জমি’ প্রকাশিত হলেও জুয়েলের কোনো বই প্রকাশ পায়নি।

শওকত হোসেন, রাজু আলাউদ্দিন, রফিক-উম-মূনীর চৌধুরী, হামিদ রায়হান, প্রিসিলা রাজ, অশোক দাশগুপ্ত, মুজিব মেহদী, শহীদুল হক খান শ্যানন প্রমুখ তরুণ অনুবাদে নিরন্তর শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। রফিক-উম-মূনীর চৌধুরীর সম্পাদনায় বেরিয়েছে ‘সিন্দাবাদ’ নামে একটি অনুবাদ পত্রিকাও।

মুজিব মেহদীর ‘সটোরি লাভের গল্প’ পাঠকের মনোযোগ পেয়েছে। মার্কেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করেছেন অদিতি ফাল্গুনী ‘গোত্রপিতার হেমন্ত’ নামে। ‘ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিসিউড’ নামে মার্কেসের নোবেল পুরস্কার পাওয়া বইটি বেশ কয়েকজন অনুবাদ করেছেন, তবে এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আসে জি এইচ হাবীবের নাম। অন্যদের মধ্যে শাহাবুদ্দিন ভূঁইয়া, প্রমিত হোসেন অন্যতম।

আসাদ চৌধুরী করেছেন উর্দু কবিতার অনুবাদ। বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দু কবিদের লেখা নিয়ে তাঁর সংকলন ‘বাড়ির পাশে আরশিনগর’। অনুবাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু অনুবাদের ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর অনুবাদে বেরিয়েছে খুশবন্ত সিংয়ের ‘অবিস্মরণীয় নারী’, ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’, ওরিয়েনা ফালস্নাচির ‘সাক্ষাৎকার’ ইত্যাদি। দরবেশ আলী খান অনূদিত টমাস মোরের ‘ইউটোপিয়া’, সালাহউদ্দিন আইয়ুবের ‘আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা’, ‘সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা’, ফয়েজ আলমের অনুবাদে এডওয়ার্ড, ডব্লিউ সাঈদের ‘ওরিয়েন্টালিজম’, সাঈদের ‘রিপ্রেজেন্টেশনস অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল’ অনুবাদ করেছেন দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু ও মাহবুবা নাসরীন।

বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুবাদের একটি বিশিষ্ট ঘরানার নাম হচ্ছে সেবা প্রকাশনী। জুলভার্ন, হেনরী রাইডার, মার্ক টোয়েন থেকে শুরু করে বিশ্ব সাহিত্যের নামকরা সব লেখকের ক্লাসিক মর্যাদার বইগুলো অনূদিত হয়ে এসেছে সেবার দক্ষ অনুবাদকদের হাত দিয়ে। অবশ্য সেবা প্রকাশনীর একটা নিজস্ব মনোপলি রয়েছে অনুবাদের ক্ষেত্রে।

ব্যবসায়িক দিকটা দেখতে গিয়ে কোনো কোনো বইয়ের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করতে হয়েছে ওদের। তবে এতে বইয়ের মৌলিকত্ব নষ্ট হয়েছে এমন বলা যাবে না। বরং সংক্ষিপ্ত কাহিনি ও ভাষার টান-টান ঋজুতার কারণে পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে বেশি। সেবার কর্ণধার কাজী আনোয়ার হোসেনের 'মাসুদ রানা' থ্রিলার সিরিজটি মূলত বিদেশি কাহিনির অনুসরণেই লিখিত হয়। সেবার অনুবাদকদের মধ্যে আছেন নিয়াজ মোরশেদ, খসরু চৌধুরী, শেখ আবদুল হাকিম, শামসুদ্দীন নওয়াব, রকিব হাসান প্রমুখ।

হাসান খুরশীদ রুমীর সম্পাদনায় অনুবাদের মাধ্যমে বেরিয়েছে লুই লামুরের গল্প। বুনো পশ্চিমের অস্থির সময়কে মার্কিন এ লেখক তুলে এনেছেন তাঁর গল্পে। প্রকৃতপক্ষে কাজী আনোয়ার হোসেন প্রতিষ্ঠিত সেবা প্রকাশনীই প্রথম ওয়েস্টার্ন নামে এধরনের বই প্রকাশ করে, যা আমেরিকার 'কাউবয়' সংস্কৃতিকে বাঙালি পাঠকদের কাছে পরিচিত করেছে। সেবার ওয়েস্টার্ন অবশ্য সরাসরি অনুবাদ নয়। এতে লেখকের নিজস্বতার ছাপও থাকে। লেখক প্রয়োজনে মার্কিন ওয়েস্টার্ন কাহিনীকে পরিবর্তিত করে পরিবেশন করে থাকেন। সেবা'র ওয়েস্টার্ন লেখকদের মধ্যে রওশন জামিল, কাজি মাহবুব হোসেন, শওকত হোসেন তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। হালে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে মাসুদ আনোয়ার, গোলাম মওলা নঈম, কাজী মায়মুর হোসেন প্রমুখ পাঠকপ্রিয়।

অধুনালুপ্ত মস্কোকেন্দ্রিক প্রগতি ও রাদুগাও অনুবাদের একটি বিশিষ্ট ঘরানা তৈরি করেছিল। হায়াৎ মামুদ, দ্বিজেন শর্মা ও ননী ভৌমিকের মত মানসম্পন্ন অনুবাদকরা কাজ করতেন প্রগতিতে। নতুন প্রজন্মের অনুবাদকদের মধ্যে জাহীদ রেজা নূর এখনো আঁকড়ে রেখেছেন রুশ সাহিত্য অনুবাদের ধারাটি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র সক্রিয় রয়েছে প্রায় দেড় যুগ ধরে। বিশ্বের নানা ভাষার সাহিত্য অনুবাদের পাশাপাশি এই সংস্থাটি বাংলা ধ্রুপদী সাহিত্যেরও পুনর্প্রকাশ করে চলছে। বিদ্যালয়কেন্দ্রিক পাঠচক্রের কারণে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রতিদিনই অনুবাদ হচ্ছে সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যের গল্প, কবিতা, উপন্যাস। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশে। অনুবাদের ভালো-মন্দ বিচার করবে মহাকাল। সমকালের পাঠকের প্রত্যাশা, অনুবাদের এই কলোল্লালিত ধারা প্রবহমান থাকুক।

অনুবাদচর্চা ও অনুবাদের সমস্যা, অন্তরায়, প্রতিবন্ধকতার কথা এখানে আলোচনা করা যায়। অনুবাদের প্রধান প্রতিবন্ধকতা সংশিস্নষ্ট লেখক বা প্রকাশকের অনুমতি পাওয়া। সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যের এমন অনেক বই আছে, যেগুলো অনূদিত হওয়া খুবই দরকার। কিন্তু লেখক বা সংশিস্নষ্ট প্রকাশক থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া বেশ দুষ্কর। ফলে অনেকে গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনুবাদ বা অনুবাদের পর প্রকাশ করতে পারেন না। গ্রন্থস্বত্ব বা কপি রাইট আইনের ফাঁকে আটকে যান। এ ক্ষেত্রে অনুবাদক বা প্রকাশক নিজের উদ্যোগে বিষয়টির ব্যবস্থা করেন। সরকার এই অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সত্যি যে, বাংলাদেশে সে ধরনের সহযোগিতার হাত রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রসারিত হতে দেখা যায় না। অনুবাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অন্তরায় হচ্ছে পরিভাষার সীমাবদ্ধতা। প্রয়োজনীয় পরিভাষার অভাবে অনেক অ্যাকাডেমিক বই অনুবাদ করা যায় না। তৃতীয় অসুবিধা হচ্ছে, অনুবাদকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মতো প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাব। এসব সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা অতিক্রম করে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে আদাজল খেয়ে যাঁরা অনুবাদের মতো একটা দুরূহ কাজ করেন, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

আহমেদ মাওলা, ঢাকা, ২০/০৭/২০১০